একক ২ ❑ রূপকথা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২.০ প্রবন্ধ—'রূপকথা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি
২.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ
২.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

২.০ প্রবন্ধ—'রূপকথা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

রূপকথা বা উপকথা—কোনটি ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধরূপ তাহার বিচার বৈয়াকরণরা করিবেন। কিন্তু এই দুইটি নামের অন্তরালে দুই বিভিন্ন প্রকারের মনোভাবের, দুই বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। উপকথা নামটির পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়—নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির নীচের প্রতি উপর যে অবজ্ঞা সেই ভাব। কোন গুরুগম্ভীর বয়স্কলোক শিশুদের খেলা দেখিয়া যে একপ্রকার সহানুভূতিমিশ্র নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকেন, উপকথার উপর সাংসারিক লোকের যেন সেই প্রকারের নাসিকা-কুঞ্চন। পক্ষান্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা করা হইতেছে, উপেক্ষিতকে অতীতের আঁধার গুহা হইতে সূর্যালোকে টানিবার আয়োজন হইতেছে, কুণ্ঠিত, সংকুচিত গ্রাম্য-সাহিত্যের সংগঠন মোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরও বিস্তৃত হইয়াছে। এই অতীত প্রত্যাবর্তন সকল দেশের সাহিত্যেরই একটা সনাতন রীতি। ইংরেজী সাহিত্যেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অতীতে প্রত্যাবর্তন, মধ্যযুগের পল্লীগাথার রসাস্বাদন চেষ্টা একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই অতীতের প্রতি মোহের কতকগুলি গূঢ় কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ, বর্তমানের তীক্ষ্ণ, জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপায়-আবিষ্কার, তাহার শত নাগপাশের বেষ্টন হইতে আত্ম-মোচনের চেষ্টা। অতীতের সরল, সমস্যা-বিরল, মুক্ত বায়ু আমাদের প্রশ্নসংকুল জীবনকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মত রক্ষণশীল জাতির পক্ষে জাতীয়ত্বের গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যে লুক্কায়িত আছে; সুতরাং এই নব জাগরণের দিনে, যখন আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তখন এই অতীতেরই কোন অন্ধকার, অব্যবহৃত কক্ষে সেই বিস্মৃত রত্নের অন্বেষণের বিবরণ কেবল যে একটা নূতন ধরনের সাহিত্যিক খেলা তাহা নহে, একটা পবিত্র কর্তব্যও বটে। সেইজন্য অতীতের মন্দিরতলে দুইদল সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক যাইয়া সমবেত হইতেছে—এক স্বপ্নপ্রবণ বিরাম-বিলাসীর দল অতীতের মধ্যে শান্তিকুঞ্জ রচনা করিতেছে; আর এক উৎসাহী অনুসন্ধিৎসুর দল তাহাদের সমস্ত কৌতূহলের সহিত তাহার কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।

এই প্রবল কৌতূহলের ধারা রূপকথাকেও ঠাকুরমার মুখ ও নিভৃত গৃহকোণ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে এবং আধুনিক সমালোচকেরা সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আদর্শে ইহার বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে।

আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালীও ইহার ছিল না। ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা চঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কল্পনা-প্রবণ আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল শিশুহৃদয় এবং ঠাকুমার স্নেহসিক্ত, সরস, তরল কণ্ঠস্বর; এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে, তাহা স্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বই-এর পাতায় ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুটির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। শিশুচিত্তের উপরে ইহার অনুপম প্রভাব বুঝিতে হইলে আগে শিশুর মনোজগতের কতকটা পরিচয় থাকা চাই। পুর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি—যাঁহার মনে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারে প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার নিকট পৃথিবী আপনার সম্পূর্ণ রহস্যভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে,—তাঁহার ইহার মধ্যে প্রকৃত রসের সন্ধান না পাইবারই কথা। শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে তাহাতে পৃথিবীর সমুদয় রহস্য যেন নীড় রচনা করে; তাহার চিন্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে, অন্ধকারে তারার মত, নানাবর্ণের আকাশ-কুসুম ফুটিয়া থাকে। পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্বদা মশগুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্তবিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্যে, যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।

(২)

রূপকথার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান অভিযোগ—ইহার অলীকতা ও অবাস্তবতা। অবশ্য, বাস্তব না হইলেই যে কাহারও পৃথিবীতে স্থান নাই, এ কথা কেহ বলেন না। সংসারে অবাস্তবেরও একটা প্রয়োজন আছে। মাটির সহিত যোগ না থাকিলে, মাটিতে শিকড় না গড়িলেই, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে না আসিলেই কাহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও মানবমন হইতে নির্বাসিত করা যায় না। নীল আকাশ অবাস্তব হইলেও ইহা শত নিগূঢ় বন্ধনে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত আপনাকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহা আমাদের তুচ্ছ, বিড়ম্বিত জীবন-নাটকের উপর সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপের মত বিস্তৃত; ইহা আমাদের উগ্র কল-কোলাহলের উপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়; ইহার ঘন নীলরূপের দিকে চাহিয়া আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহ ও অশান্ত প্রকৃতি মাথা নত করে। সুতরাং ইহাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিলে মানব-মন তাহার অনেকটা সৌন্দর্য ও উদারতা হারায়। সেই হিসাবে রূপকথারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা যে শক্তি আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরণা দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে। আমাদের মনের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকল, যাহার মুহূর্তমাত্র হৃদয়ে উঠিয়া পরমুহূর্তেই বিলীন হয়, যাহারা আমাদের বাহ্যজীবনে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে না ও যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই প্রায় অচেতন, তাহারাও মনের একটা অবিসংবাদিত ক্রিয়া বটে, এবং তাহারাও বাস্তবতার দাবি কারিতে পারে। সুতরাং রূপকথা আমাদের প্রাণে যে অস্পষ্ট আবেগ, যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যে আপাত-অসম্ভব আশা-কল্পনা জাগাইয়া তোলে তাহারা যে অবাস্তব, আমাদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, একথা বলিতে পারি না। তাহারা এখন অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে কিন্তু স্ফুটতাই বাস্তবতার একমাত্র লক্ষণ নহে।

রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যে ও সেই মানব-

মনের আদিম-সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য-পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তিসম্পদ-লাভ, পাপপূণ্যের জয়-পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিসই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সব রাক্ষস-খোক্ষস আমাদের পথরোধ করে তাহারা আমাদের পার্থিব বাধা বিঘ্নেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র; যে অনুকূল দৈব বেজ্ঞামা-বেজ্ঞামীর রূপে সেই সমস্ত রাক্ষস-খোক্ষসের মৃত্যুরহস্য আমাদিগকে শিখাইয়া দেন, তিনি যেন অযাচিত সাহায্যের দ্বারা এই পৃথিবীতে তাঁহার কার্পণ্য-কলঙ্কে স্খালন করেন এবং তাঁহার উপেক্ষার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা গূঢ় অভিমান পোষণ করি, তাহার কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে প্রয়াস পান। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিজন রাক্ষসপুরে যে রাজকন্যা প্রবালপালঙ্কে নিদ্রামগ্না থাকেন তিনি আমাদের গোপন-অন্তঃপুরশায়িনী প্রেয়সী; যে বাধাবিপদের মধ্য দিয়া রূপকথার নিজ প্রিয়াকে লাভ করেন, তাহা আমাদের বর্তমান বণিক্‌ধর্মী বিবাহের উপর আমাদের অন্তঃস্থ আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মাত্র। পাতালপুরে নাগকন্যার প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে আমরা এই চিরপরিচিত পৃথিবীর স্পর্শ অনুভব করি এবং তাহার মণিমাণিক্য-দীপ্ত কক্ষের মধ্যেও এই নিত্যসহচর, পরিচিততম সূর্যালোকের দর্শন পাই।

(৩)

এই রূপকথার রচয়িতার কোন নামকরণ হয় নাই। সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের ন্যায় এখানেও লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এখানে ব্যক্তি বিশেষের কোন কথা না; সমস্ত জাতিরই প্রাণের কথা, অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের ইহা একটি অদ্ভুত গুণ। মহাকাব্যের বিশাল দেহে অনেক নামহীন লেখক নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেন জাতির আত্মা বৃন্তহীন পুষ্পসম 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হইয়া উঠিয়াছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা রাখে নাই। লৌকিক গানে গাথায় ও সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাব লক্ষিত হয়; যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। রূপকথার রাজ্যেও সেই একই নিয়ম—কোথাও লেখকের নিজের এতটুকু কোন ছাপ নাই, সর্বত্র একটা উদার, বিশাল, অনাসক্ত ভাবের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। রাজা-রাজড়ার কথা ইহার বিষয় বস্তু হইলেও সাধারণ লোকের যে ক্ষীণ, সাময়িক সংকেত ইহাতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। রাজপুত্র কখনও কখনও বিপদে পড়িয়া দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন ও তাহাদের দ্বারা পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য যখন উদিত হইয়াছে, তখন তাহার কিরণ হইতে তাঁহার দরিদ্র উপকারকও বঞ্চিত হয় নাই। সর্বত্রই একটা সাম্যশান্তির ভাব; সমাজের সঙ্গে লেখক এমন সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ভাষা একেবারে মৌন হইয়া আছে।

আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যায় যে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী-বিরোধ,

সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের কাহিনী যখন বক্তার করুণার্দ্র, অশ্রুতরল কণ্ঠে কথিত হয়, তখন শিশুর ত কথাই নাই, কোন বয়স্ক ব্যক্তিও বোধ হয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। এই গল্পের উপর রামায়ণের ছায়াপাত হইলেও ইহার একটি নিজস্ব অনুপম মাধুর্য ও সৌন্দর্য আছে; ইহার অন্তর্নিহিত গভীর করুণ রস সরল, শব্দাড়ম্বরহীন ও সাহিত্যিকতা বর্জিত ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দ্রবীভূত করে। এই রূপকথার মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যা এমন একটা আদর্শ-শান্তি ও কল্পিত সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত হয় যাহা বাস্তব জীবনে একান্ত সুদুর্লভ এবং যাহার অভাব আমাদের সমস্ত জীবনপ্রবাহে একটা অব্যক্ত-মধুর, অবিচ্ছিন্ন করুণ মর্মর জাগাইয়া তোলে। এইরূপে রূপকথা বাস্তবজীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তোলে, নিষ্করুণ দৈবের বিচার উল্টাইয়া দেয়; এবং মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হইলে কিরূপ পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে আপনার ত্রুটিবহুল ও ভ্রমসংকুল জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত করিত তাহার সুস্পষ্ট আভাস দেয়।

(৪)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা হয় তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। এখন রূপকথা আমাদের জীবনের উপর কিরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবি-প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা অনেকে অনেক সময় এই রূপকথার নিকট তাঁহাদের কল্পনার উন্মেষ সম্বন্ধে প্রথম সাহায্য লাভ করেন। রূপকথার দিগন্ত-বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া অজ্ঞাতের রাজত্বে প্রথম পদক্ষেপ করিতে শিখেন। সেখানকার মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি তাঁহাদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্বশক্তিকে জাগাইয়া তোলে। যে দেশে জীবনে বৈচিত্র্য ও বর্ণসুষমার একান্ত অভাব, যেখানে শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে কোনপ্রকার দুঃসাহসিকতার অবসর থাকে না সেখানে অনেক সময় এই রূপকথার খোলা জানালা দিয়াই আমরা বিচিত্র কল্পলোকের পরিচয় লাভ করি ও 'বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী' আমাদের কর্ণপথে ধ্বনিত হয়। অনেক ইংরেজ কবি রূপকথার প্রতি তাঁহাদের ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার আত্মজীবন-কাহিনীতে এই লৌকিক গল্প কিরূপে তাঁহার কল্পনা-শক্তিকে উন্মেষিত করিয়াছিল কিরূপে ইহার সাহায্যে তিনি প্রাত্যহিক জীবনের তুলনা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া এক বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দভ্রমণের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিশু' নামক কাব্যে শিশুচিত্তের উপর রূপকথার এই মায়াময় স্পর্শটি সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।

আর আমাদের মধ্যে যাঁহার কবিত্ব-সৌভাগ্যের অনধিকারী তাঁহারাও ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও তাহার অন্তরে একটি কুহেলিকাময় প্রদেশ আছে, যাহা হইতে তাহার সমস্ত রঙীন অসম্ভব কল্পনার আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা সমস্ত তর্ক যুক্তি বাস্তবতার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার মনে একটি ছায়াস্নিগ্ধ স্থায়ী কল্পনালোক রচনা করে। প্রত্যেকেই তাহার প্রাত্যহিক, নীরস, যন্ত্রবদ্ধ কাজের অবসরে এই কল্পলোকে, এই কল্পনার দুর্গে ক্ষণিক আশ্রয় করে; এখানে বসিয়াই সে আকাশকুসুম চয়ন করে ও শূন্যে প্রাসাদ

নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্বোধ্য ও রহস্যময়, যাহাই আমাদের উন্মুখ আশাকে 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' আকর্ষণ করে,—এই সকলই আমাদের অন্তরের কল্পলোক রচনায় সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম ভিত্তি স্থাপনের প্রশংসা রূপকথারই প্রাপ্য। রূপকথারাজ্যের মেঘখণ্ড আমাদের শিশু অন্তরের গোপন স্তরে প্রথম সঞ্চারিত হয়, তখন পরবর্তী জীবনের রহস্যবোধকে, তাহার সমস্ত আলো-ছায়া-ঘেরা বিচিত্রতাকে আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনে; এবং সেই সঞ্চিত মেঘরাশির চতুর্দিকেই আমাদের কল্পনার বিদ্যুৎবিলাস স্ফুরিত হয়। শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানব-হৃদয়ের সনাতন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তির বশে যখন আমরা সুদূর শৈশবের প্রতি উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করি তখন তাহার সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুক ও উচ্ছ্বাস চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ষারাত্রের রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের অন্তরে শুকতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে ও আমাদের বৈচিত্রহীন প্রৌঢ়জীবনের উপরও তাহার মায়াময় ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।

২.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ঃ ২৩/০২/১৮৯২–মৃত্যু ঃ ২৮/২/১৯৭০)

বীরভূম জেলার কুশমোর গ্রামে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক। ১৯০৬ খ্রীঃ হেতমপুর কলেজ থেকে চতুদর্শ স্থান অধিকার করে এফ. এ ও পরে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজীতে ঈশান স্কলার হয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯১২ তে এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৭ খ্রীঃ পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর পি. এইচ. ডি. গবেষণার বিষয় ছিল—'রোমান্টিক থিওরি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিজ'। রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অধ্যাপনা ও রাজসাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করার পরে আবার কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে আসেন। এরপর সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে যুক্ত হন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৯৩৮); বাংলা উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের অপরিসীম।

এখানে তাঁর স্বচ্ছ বিশ্লেষণী প্রতিভা এবং বিপুল জ্ঞানসমুদ্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' তাঁর অন্যতম সমালোচনা গ্রন্থ। এটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৭ সালে। তাঁর রচিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' (১৯৬২) এবং 'রবীন্দ্রসৃষ্ট-সমীক্ষা' (দুই খণ্ড ১৯৬৫-১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য রচনা। সমালোচক হিসেবে তিনি রসবাদী ও ঐতিহ্যপন্থী।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার ধারা ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর সমালোচনার ধারা নিয়ে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "তীব্র রসানুভূতির সহিত সূক্ষ্মবিচারশক্তির, মর্মগ্রাহীতার সহিত মননশীলতার, ভাবোল্লাসের সহিত স্থির বুদ্ধির যে অসামান্য সহযোগ তাঁহার সমালোচনায় দেখা যায়, তাহা মনস্বিতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ"।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন সাহিত্যক্ষেত্রে যত রকম রীতি, তত রকম মতবাদ। তবে তাঁর সমালোচনা সম্পর্কে অনেক সময়ে পাঠকরা দুরূহতার অভিযোগ তুলেছেন। এই দুরূহতার কারণ মূলতঃ তীব্র রসবোধজনিত তীক্ষ্ম বুদ্ধি। তাঁর উপলব্ধিকে তিনি সবসময়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিসম্মত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর 'রূপকথা' নামে প্রবন্ধটি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য এটিই তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধ।

২.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

'রূপকথা' বা 'উপকথা' ব্যাকরণগত শুদ্ধ রূপ যেটাই হোক, তার বিচারের ভার বৈয়াকরণদের। কিন্তু 'উপকথা' আখ্যার পেছনে আছে একধরণের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব। বিপরীতে 'রূপকথা' নামটি ঘিরে আছে রহস্যময়তা, যা আমাদের হৃদয়ের বিভিন্ন সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে দেয়। সাহিত্য সমালোচকের 'উপকথা' নামটি পছন্দ হলেও রসপিপাসু পাঠক 'রূপকথা' নামটিরই পক্ষপাতী হবে।

এখন নানাদিক থেকে সাহিত্যের যে পুরোনো সুরটিকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে, রূপকথা ও তার মধ্যে একটি। এই অতীতে প্রত্যাবর্তন সব দেশের সাহিত্যেরই একটা সনাতন রীতি। বাংলা সাহিত্যে এই অতীত রোমন্থনের একাধিক কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ বর্তমানের জটিল সমস্যা থেকে পালানোর উপায় খোঁজা। দ্বিতীয় কারণ অতীত সাহিত্যে নিজেদের জাতীয়ত্বের রহস্য খোঁজা। সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে দু'দল অতীত সাহিত্যচর্চা করে চলেছে। একদল অতীতের মধ্যে শান্তির আশ্রয় খুঁজেছে, অন্যদল নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের অতীত সাহিত্যের আশ্রয় নিচ্ছে। আর এর ফলে আধুনিক সমালোচকরা রূপকথাকে ঠাকুরমার মুখ থেকে টেনে এনে (আধুনিক) সাহিত্যের মূলধারা নিয়মে বিচার করতে শুরু করেছে। কিন্তু রূপকথা আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে গড়ে ওঠে নি। রূপকথাকে বিচার করতে হলে এর জন্মমুহূর্তের অনুষঙ্গে একে বিচার করা উচিত। রূপকথা বলার পরিবেশ, শ্রোতা এবং বক্তার সক্রিয় ভূমিকায় রূপকথা যে রহস্যময় হয়ে ওঠে, ছাপার বইয়ে তা পাওয়া যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অর্থাৎ যাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ পরিষ্কার, রূপকথার আবেদন তাদের কাছে নয়। রূপকথার প্রভাব মূলতঃ শিশুচিত্তের ওপর। শিশুমনের অভ্যন্তরে যে অন্ধকার তা কল্পনাময়। সম্ভব-অসম্ভবের আশা কল্পনায় রঙীন নেশায় সে মশগুল। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তারই জন্য যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজের কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করেনি।

(২)

রূপকথার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান অভিযোগ এর অবাস্তবতা । কিন্তু মানবসংসারে অবাস্তবের প্রয়োজন আছে। নীল আকাশ অবাস্তব হলেও তা নানাভাবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে রেখেছে। এর ঘন নীল রূপ আমাদের উগ্র কোলাহল মুখর জীবনের ওপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ। ফলে এই হিসেবে আমাদের জীবনে রূপকথারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপকথা অবাস্তব নয়। বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা স্থূল বা আমাদের জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটায় তা একমাত্র বাস্তব এমন নয়। আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি, যেগুলির আমাদের বাহ্যজীবনে প্রায় কোনোরকম স্থায়ী প্রভাব নেই, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা নিজেরাই অচেতন। সেগুলিও বাস্তব। ফলে রূপকথা আমাদের মনে যে আবেগ, কল্পনা জাগিয়ে তোলে, তা অবাস্তব নয়।

রূপকথা ছদ্মবেশের মাধ্যমে আমাদের মনের সঙ্গে এর প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু রূপকথার রাজ্যেও আসলে মানব মনের আদিম সনাতন রীতি অর্থাৎ সুখের সন্ধান, দুঃখের অবসান ইত্যাদিরই আধিপত্য। পৃথিবীর পরিচিত মূর্তিগুলিই এক অতিরঞ্জিত হয়ে, কল্পনায় সামান্য রূপান্তরিত হয়ে রূপকথার রাজ্যে হাজির হয়। রূপকথার রাক্ষস-খোক্ষস আসলে আমাদের পার্থিব বাধা বিপত্তির রূপান্তরিত প্রকাশ। রূপকথার বেজ্ঞামা-বেজ্ঞামি আমাদের পার্থিব জীবনের কল্পনার দৈবশক্তি। সাত সমুদ্র তের নদীর পারের রাজকন্যা আসলে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী। রাজপুত্রের রাজকন্যালাভে বাধাবিপত্তি আসলে বর্তমান বণিকধর্মী বিয়ের ওপর আদর্শ প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস। পাতালপুরের নাগকন্যার প্রাসাদও আসলে আমাদের পরিচিত এই পৃথিবী।

(৩)

সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের মতই রূপকথারও কোন রচয়িতার নাম পাওয়া যায়না। ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমস্ত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাই রূপকথায় ধ্বনিত হয়েছে। মহাকাব্যেও লৌকিক গানগাথা সহ সমস্ত পুরনো সাহিত্যেই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাবটি লক্ষ্য করা যায়। এই রচনাগুলি যেন কোন ব্যক্তি রচয়িতার নয়, সমস্ত জাতির সম্পত্তি। রূপকথাতেও লেখকের কোন ছাপ থাকে না, মূলতঃ রাজারানীর কথা হলেও সাধারন মানুষের প্রতি এগুলিতে অবজ্ঞার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাজপুত্রও বাধ্য হয়ে শৈশব অবস্থায় দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতা ফিরে পেলে সেই দরিদ্র পরিবারও তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। ব্যক্তিলেখক এমনভাবে এখানে সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে, তাঁর ব্যক্তিজীবন কোনভাবেই এখানে প্রতিফলিত হয়নি।

রূপকথার রচনার কাল যথাযথভাবে বলা না গেলেও এটা ঠিক যে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়করণের পরেই এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন রূপকের মধ্যে দিয়ে এগুলিতে আমাদের বাংলার পরিবার ও সমাজের ছবি পাই। আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে এখানে হাজির হয়েছে। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের রূপকথা, যা শুনে যে কোনো বয়সী শ্রোতার চোখেই জল আসবে। সেই কাহিনীর মধ্যে রামায়ণের ছাপ থাকলেও তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে যা আড়ম্বরহীন। সাহিত্যিকতাবর্জিত ভাষার সাহায্যে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এই রূপকথার মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানান সমস্যার আদর্শ ও কল্পিত সমাধান থাকে, যা বাস্তব জীবনে দুর্লভ এবং যার অভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে করুণ করে তোলে। এইভাবে রূপকথা বাস্তব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে নিস্করুণ দৈবের বিচারকে উল্টে দেয় এবং মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হলে কেমন সুখ শান্তিতে দিন কাটাত তার আভাস দেয়।

(৪)

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ, তার বিশেষ কোন ভিত্তি নেই। রূপকথা আমাদের জীবনের ওপর কিছু স্থায়ী প্রভাবও বিস্তার করে। যেমন—যারা কবি স্বভাবের অধিকারী, রূপকথা তাদের কল্পনা উন্মেষে সাহায্য করে। বাস্তব জীবন যেখানে গতানুগতিক, সেখানে রূপকথার মাধ্যমেই কল্পলোকের দরজা খুলে যায়। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, লৌকিক গল্প কিভাবে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে কল্পনার রাজ্যে ভ্রমনের সুখ দিয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর 'শিশু' নামক কাব্যে শিশুর মননে রূপকথার স্পর্শটি সজীব করে রেখেছেন।

যাঁরা কবিস্বভাবের নয়, তাঁরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষ প্রাত্যহিক কাজের অবসরে নিজ অন্তরের কল্পলোকে আশ্রয় নিয়ে আকাশকুসুম চয়ন করে। আমাদের জীবনের যা কিছু অপ্রাপ্য, দুর্বোধ্য, রহস্যময় সে সবই এই কল্পলোক রচনায় সাহায্য করেছে। কিন্তু নিজ অন্তরে এই কল্পরাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের প্রধান কৃতিত্ব রূপকথারই প্রাপ্য। রূপকথার সূত্রেই শিশুহৃদয়ে এই কল্পলোকের সূচনা। শৈশবের প্রতি যে আমাদের আসক্তি, তার কারণ শৈশবের বর্ষা রাতের রূপকথা শোনার সেই অপরূপ স্মৃতি, যা আমাদের বৈচিত্র্যহীন প্রৌঢ় জীবনের ওপরও তার ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।

২.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যসমালোচক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'রূপকথা' নামে প্রবন্ধে রূপকথার চরিত্র, রূপকথার নন্দনতত্ত্ব, রূপকথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে ওঠা অভিযোগ ও তার যথার্থতা এবং আমাদের জীবনে রূপকথার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রথম অংশে, লোককথার মধ্যে থেকে যে একটি নির্দিষ্ট রূপকে উপকথা বা রূপকথা বলা হয়, সেই নামের ঔচিত্য নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এক শ্রেণির লোক থাকে যাদের 'উপকথা' বলার মধ্যে এক ধরণের অবজ্ঞা মিশ্রিত থাকে। মানুষের মধ্যে 'উপভাষা' সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞানতাজনিত অবজ্ঞা দেখা যায়, এই অবজ্ঞা অনেকটা যেন সেই জাতীয়। তাঁর মতে 'রূপকথা' নামটির সঙ্গেই আমাদের হৃদয়ের একটা যোগ আছে।

সাহিত্যের অতীত কীর্তিগুলিকে বর্তমানের চোখ দিয়ে দেখার। বর্তমানে প্রতিস্থাপিত করার প্রচেষ্টা শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা গিয়েছিল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্যকে এদেশের সাহিত্যেও অনুকরণ করা হয়েছিল। ১৮১২ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত হয় 'ছেলে ও লোকভুলানো গল্পাবলী'। জেকব ও উইলহেম গ্রীম দুইভাই ছিলেন এর সংকলক। ইউলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' এই বছরেই ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে সঙ্কলিত হয়। এগুলির ঐতিহাসিকত্বও স্পষ্ট। রুশ লেখক ক্রীলকের গল্প বাঙলায় রূপান্তরিত করে প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। মধুসূদনের রূপান্তরিত এই গল্পগুলিও রূপকথা সংগ্রহের ও তার পাঠকসমুদায়ের আকর্ষণের কথা স্মরণ করায়। আমাদের সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই প্রচেষ্টা প্রথম সফলভাবে করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই লোককথা সংগ্রহের কাজও শুরু হয়। রেভারেন্ড লালবিহারী দে এই ধরনের লোককথার সংকলনটি ১৮৮৩ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। প্রাবন্ধিকের মতে বাংলা সাহিত্যে এই অতীতচারিতার কিছু গভীর কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হ'ল—বর্তমানের তীক্ষ্ণ জটিল সমস্যা থেকে পালানোর একটা উপায় বের করা। কারণ অতীতের যে সরল জীবন তা এই বর্তমানের সমস্যাকন্টকিত জীবনকে প্রবলভাবে আকর্ষন করে। আর দ্বিতীয় কারণ হল বাঙালি জাতির জাতীয়তার শিকড় খোঁজা। ফলে বাঙালি জাতির বাংলা সাহিত্যের অতীত চর্চার মধ্যে দুধরণের ছবি দেখা যায়, একদল বর্তমানের সমস্যাসঙ্কুল জীবন থেকে শান্তি খোঁজেন, অপরদল অতীত সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে আত্মসত্তা অনুসন্ধান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লোককথাগুলি সংগ্রহের যে কাজ প্রথম ফিনল্যান্ডে শুরু হয় সেখানে প্রেরণা হিসেবে ছিল জাতীয়তাবোধ।

সাহিত্যের এই অতীতচর্চার অঙ্গ হিসেবে রূপকথা, যা ছিল নাতি-নাতনীদের কাছে ঠাকুরমার মুখের গল্প, তাকে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে টেনে এনে আধুনিক সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। প্রাবন্ধিকের মতে এই পদ্ধতি ঠিক নয়। রূপকথার সৃষ্টি আধুনিক অনুষঙ্গে নয়, ফলে এর নন্দনতত্ত্ব আলাদাভাবে তৈরি করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের শুরুতে যারা লোকগল্পগুলিকে সংগ্রহ করছিলেন তাদের অনেকেই আধুনিক শহুরে মনন থেকে লোককথাগুলির বহু শব্দ 'অশ্লিল' বলে তার বদল ঘটাচ্ছিলেন, তার ফলে এগুলি বিকৃতভাবে আমাদের কাছে এসেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও সংগৃহিত একটি ছড়ায় 'ভাতার' শব্দটির বদলে 'স্বামী' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মতে শিশুমনে এই রূপকথা গুলি বাধাবন্ধনহীন কল্পনারাজ্যের দরজা খুলে দেয়, যার কাছে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্থায়ীভাবে টানা হয়ে গেছে রূপকথার আবেদন তার কাছে নয়।

পরের অংশে প্রাবন্ধিক রূপকথার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে রূপকথার বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ এনে রূপকথাকে অপ্রয়োজন বলা যাবে না। প্রথমতঃ আমাদের জীবনে অবাস্তবতার প্রয়োজন আছে। আকাশ অবাস্তব হলেও আমাদের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ রূপকথা সবসময় অবাস্তবের কথাই

বলে না। বাস্তব জীবনের নানা ঘটনা বাস্তব মানুষের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা অবাস্তবতার ছদ্মবেশে রূপকথাতে হাজির হয়। রূপকথার রাক্ষস আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের বিপদ, রূপকথার রাজকন্যা আসলে আমাদের বাস্তব জীবনের আকাঙ্খিত প্রেয়সী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় লোককথা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে গবেষকরা প্রাবন্ধিকের এই বক্তব্যের সাথে সহমত প্রকাশ করবেন। অন্যান্য লোককথার মত রূপকথাও বিভিন্ন রূপক, প্রতীকে পূর্ণ। গভীরে প্রবেশ করে রূপক, প্রতীকগুলির অর্থোদ্ধার করতে পারলেই অতিরঞ্জনের জায়গাগুলো সরিয়ে যথার্থ অনুধাবন করা যাবে।

রূপকথার রচয়িতার কোন নাম না পাওয়া সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য যে কোন লোকসাহিত্যেই রচয়িতার নাম থাকে না। কারণ লোকসাহিত্যে শুধু ব্যক্তি নয় আসলে একটা জাতি আত্মগোপন করে থাকে। লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হল এগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, জাতির সামগ্রিক ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে, এবং এটি এক ধরণের উদারতা। এই উদারতা যেমন ব্যক্তিনামের অভাবের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়, তেমনি লোকসাহিত্যের, লোককথাও এই উদারতায় পরিপূর্ণ। রাজপুত্র বিপদে পড়ে দরিদ্রের কুটিরে আশ্রয় নিলেও বিপদ কাটিয়ে উঠলে সেই দরিদ্রেরও ভাগ্য ফিরে যায়। এই রূপকথাগুলির রচনার কাল নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এটা পরিস্কার যে, বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণের পরেই এগুলির সৃষ্টি। এই রূপকথাগুলির মধ্যে বাঙালির সামাজিক জীবনের নানা ছবিকেই ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই রূপকথাগুলির মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যার এক আদর্শ সমাধান দেখা যায়। ফলে প্রাবন্ধিকের মতে রূপকথা আমাদের জীবনে নানা কারণেই প্রয়োজনীয়, একদিকে এগুলি আমাদের বাস্তবজীবনের নানা অবাস্তবতা পূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হলে যে জীবন সুখ ও শান্তির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হত তার আভাস দেয়।

প্রাবন্ধিকের মতে রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা হয় তার ভিত্তি তো নেইই বরং রূপকথা আমাদের মনে কিছু স্থায়ী প্রভাব ফেলে। যারা কবিত্ব শক্তির অধিকারী তাঁদের অধিকাংসের কল্পনার উন্মেষ প্রথম ঘটে রূপকথার সূত্রে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং রবীন্দ্রনাথের নাম করেছেন। তবে, যারা কবিত্ব শক্তির অধিকারী তাদের মনেই শুধু রূপকথার আবেদন, এমন নয়;যারা কবিত্ব শক্তির অধিকারী নয় তাদের মনেও তর্ক, যুক্তি, বাস্তবতার প্রভাব কাটিয়ে রূপকথা কল্পলোক সৃষ্টি করে। যার ফলে এই সমস্ত মানুষরাও নিজেদের জীবনে যা কিছু অপ্রাপ্য, দুর্বোধ্য সেগুলিকে এই কল্পনার সাহায্যে প্রাপ্য করে তোলে। এই যে কল্পলোক, এই যে রহস্যময়তা, তা একদম শিশুবয়সে রূপকথা শোনার মধ্যে দিয়েই তৈরি হয়। ফলে প্রাত্যহিক বৈচিত্র্যহীন, অপ্রাপ্তির জগত থেকে মুক্তি পেতে প্রতিটি মানুষই শৈশবে ফিরে যেতে চায়। কারণ শৈশবের সেই বর্ষা রাত্রির মোহময় রূপকথা শোনার স্মৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান পৃথিবীতে একটি মানবশিশু জন্মের পর থেকেই যে ইঁদুর দৌড়ে ঢুকে যায়, তাঁর ফলে তার মনের বিকাশ ভালো মাত্রাতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে মনে করেন মনস্তাত্বিকরা যে কারণে বর্তমান পৃথিবী তে মনস্তাত্বিক সমস্যা, সব থেকে বড় সমস্যা বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে যেহেতু আর ঠাকুমা-দিদিমাদের পক্ষে নাতি-নাতনিদের রূপকথার জগতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ফলে নির্মাণ হচ্ছে নতুন ধরণের রূপকথা। এখন আর রূপকথায় রাজা-রানী থাকে না থাকে 'হ্যারি পটার' বা 'পোকেমন'রা। তবে শিশু মনস্তত্বের ওপর কাল্পনিক জগতের প্রভাব আজও বিতর্কিত এক বিষয়।

প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্তর্গত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। কথানুযায়ী এটি তাঁর প্রথম লেখা প্রবন্ধ। কিন্তু এ প্রবন্ধের বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং যৌক্তিকতাকে তিনি এত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন যে প্রবন্ধটির গভীরতা যে কোন পাঠকের কাছে মনস্কতার দাবী করে। ভাষা এবং উপস্থাপন ভঙ্গীর সরলতা এ প্রবন্ধের একটি বড় সম্পদ।